**কেমন বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরতে চাই**

সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রনালয় থেকে ঘোষণা এসেছে যে ১৫ই অক্টোবরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া হবে। এইজন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে বলা হয়েছে।

এই বছর এর আগেও একবার সিদ্ধান্ত হয়েছিলো গত ২৪শে মে থেকে বিশ্ববিদ্যালয় খুলবে। কিন্তু করোনা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ার কারণে সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে হয়েছিলো। এদিকে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে অক্টোবরে কোভিডের আরেকটি ওয়েভ আসার সম্ভাবনা আছে। তাই সব মিলিয়ে পরিস্থিতি কি হতে যাচ্ছে তা বলা যাচ্ছে না।

তবে এর মধ্যে সেপ্টেম্বরের ১২ তারিখ থেকে স্কুল খুলে যাচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার ব্যাপারে বিশ্বে তালিকার প্রথম সারিতে বাংলাদেশের নাম আছে। এছাড়া এই নিয়ে অভিভাবক, ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে ব্যাপক অসন্তোষের মধ্যে সরকার অনেকটা এই ঘোষণা দিতে বাধ্য হয়েছে।

তবে এটা নিশ্চিত তো যে আগে হোক পরে হোক বিশ্ববিদ্যালয় খুলতে যাচ্ছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা কি দেড় দুই বছর পরে সেই আগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেই ফিরে যেতে চাই নাকি এই সাময়িক বিরতিতে নতুন উপলদ্ধি, নতুন মননে নতুন করে সব শুরু করতে চাই।

আগের বিশ্ববিদ্যালয়টি কেমন ছিলো? বিশ্ববিদ্যালয়টি কেমন ছিল, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের মান নির্ণয়ের প্রধান উপাদানগুলোর দিকে নজর দিতে হবে।

এই উপাদানগুলোর মধ্যে অবশ্যম্ভাবীভাবেই আছে শিক্ষা আর গবেষণা। এই দুই ক্ষেত্রেই আমরা অনেক পিছিয়ে আছি কোন সন্দেহ নাই। বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এই দুটি বিষয়ে মানের ক্রমনিম্ন গতি নিয়ে অনেক কথা হয়েছে তাই এই নিয়ে নতুন কিছু বলার নেই।

কিন্তু যেই বিষয়টিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসঙ্গে তেমন কোন কথাবার্তা হয় না, সেটি হলো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসা হাজার হাজার ছাত্র ছাত্রীদের মানবাধিকার লংঘন ।

এইসব বৈষম্যের শিকার ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে বেশীরভাগই যারা ঢাকার বাইরে মফস্বল বা গ্রাম থেকে আসে, ঢাকায় থাকার সুব্যবস্থা করা যাদের জন্য অনেক কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তাঁদের জন্য আবাসিক হলগুলোতে থাকার ব্যবস্থা পাওয়াটা লটারীতে কোটি টাকা পাওয়ার মতনই মূল্যবান।

সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে ছাত্র ছাত্রীদের এই গুরুত্বপূর্ন বিষয়টি নিয়েই তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে সবচেয়ে বেশী নিগৃহীত এবং শোষিত হয়।

বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র ছাত্রীদের আবাসন প্রক্রিয়ার একটা হাইব্রীড সিস্টেম চালু আছে যেটি আমার ধারণা পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। এই হাইব্রীড সিস্টেমে কিছু সংখ্যক ছাত্র তাঁদের যোগ্যতা আর প্রয়োজনের ভিত্তিতে আবাসিক হলগুলোতে জায়গা পায়। কিন্তু একটি বিশাল সংখ্যক ছাত্র ছাত্রীদের হলে ঢোকানো হয় পিছনের দরজা দিয়ে।

এই প্রক্রিয়াটি সাধারণত পরিচালিত হয় ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠন দ্বারা। এটি একটি সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। এর সাথে ছাত্রদের কল্যানের কোন সম্পর্ক নাই।

এই বিশাল সংখ্যক ছাত্র ছাত্রীকে পেছনের দরজা দিয়ে ঢোকানোর প্রক্রিয়াটি করা হয় আবাসন সংকটকে কেন্দ্র করে। এই সংকটটি কিছুটা সত্যি সত্যিই রয়েছে আর অনেকটাই কৃত্রিমভাবে তৈরী করা হয়েছে।

এই সংকটের মূল রয়েছে বেশ গভীরে আর সেটি হচ্ছে এই দেশের অসুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে। যুগ যুগ ধরে স্বাধীন বাংলাদেশে এই দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মনে করে না। তাঁদের কাছে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মূলত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ধরা হয় রাজনীতির সূতিকাগার। দেশের সব বড় বড় রাজনৈতিক আন্দোলনগুলো এখান থেকেই হয়েছিলো। তাই শাসকগোষ্ঠীর শ্যেন নজর থাকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের উপর। যে কোন মূল্যে তাঁরা তাঁদের প্রাধান্য নিশ্চিত করতে চায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ।

এই প্রাধান্য নিশ্চিত করার জন্য সেই জন্য একটি অনুগত ক্যাডার বাহিনী থাকা খুব জরুরী হয়ে যায়। এই আনুগত্য আদায় করার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো মূলত ঢাকার বাইরে থেকে আসা ছাত্রছাত্রীদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটি সেটির উপর দখল নেয়া। ঢাকা শহরে গ্রাম বা মফস্বল থেকে আসা ছাত্রের জন্য আবাসন ব্যয় হচ্ছে অসম্ভব বেশী। তাই আবাসিক হলগুলোতে থাকার জন্য এইসব ছাত্র ছাত্রীরা একরকম মরিয়া থাকে।

এই সুযোগটাই নেয় রাজনৈতিক নেতৃত্বে থাকা ছাত্রসংগঠন। সেই সাথে থাকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের আশীর্বাদ। আর অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে এই পুরো প্রক্রিয়াটি সংঘটিত হয় আমাদের সহকর্মী শিক্ষকদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগিতায় এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উদাসীনতায়।

বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে উঠে আসা দরিদ্র পরিবারের একজন মেধাবী ছাত্র,হয়তো সে জীবনে প্রথমবার বা দ্বিতীয়বারের মতন ঢাকায় এসেছে সে হয়তো অনেক আশা, উত্তেজনা এবং রোমাঞ্চ নিয়ে একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসে। কিন্ত যখন সে এসে হলে ক্যাডারদের খপ্পরে পড়ে হলের গণরুমে যেয়ে ঢোকে তখন সেই আশা মিইয়ে যেতে বেশী সময় লাগে না।

জানা যায় যে এই সহজ সরল ছাত্রদের দয়ামায়াহীন রুক্ষ এবং কর্কশ ক্যাডার বানানোর একটি ম্যানুয়াল পর্যন্ত আছে। বিশেষ করে বিভিন্ন বর্ষে সেই ধাপগুলো একটা প্যারামিলিটারি বাহিনীর মতন পালন করা হয়।

এর মধ্যে একটা অন্যতম উপাদান হলো প্রায়শই তাঁদের রাতে ঘুমাতে দেয়া হয় না। উঠিয়ে নিয়ে মিছিল করানো হয়। অথবা বলা হয় ক্যাম্পাস ঘুরে ঘুরে দেখো। পরের দিন সকালে ক্লাস আছে নাকি পরীক্ষা আছে সেটি কোন বিবেচ্য বিষয় নয়। 'দেশমাতৃকার সেবায়' রাজনৈতিক ক্যাডার তৈরীর প্রক্রিয়ায় পড়াশোনার মতন 'তুচ্ছ' বিষয়কে গুরুত্ব দিলে চলে না।

এছাড়া যখন তখন রাজনৈতিক কর্মসূচী, মিছিল মিটিং এ যোগদান বাধ্যতামূলক। নেতৃস্থানীয় ছাত্র ছাত্রীরা সবসময় ঈগলচক্ষুর মতন ক্ষুরধার নজর রাখেন কেউ অনুপস্থিত কিনা। ক্লাস বা পরীক্ষার দোহাই দিয়ে পার পাওয়া এইসব ক্ষেত্রে মোটামুটি অসম্ভব। তারপরেই কোন ছাত্র যদি সেই কাজটি করে ফেলে তাহলে তাঁর ধরা পড়া মোটামুটি সুনিশ্চিত।

এই অন্যায়ের বলি হিসেবে ছাত্ররা চরম মানসিক আর শারীরিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যায়। যারা প্রাণে বেঁচে যায় তাঁদের কথা আমাদের কানে আসে না। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের হাফিজুর মোল্লার কথা আমরা জানতে পারি কারণ সে তাঁর জীবন দিয়ে আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো আসলে ছাত্রদের জন্য নিরাপদ কোন আবাসন নয়, বরং এক একটি টর্চার চেম্বার। নিউমোনিয়া ও টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র হাফিজুর ২০১৬ সালের ২ ফেব্রুয়ারি মারা যান। তিনি সলিমুল্লাহ মুসলিম (এসএম) হলের বারান্দায় থাকতেন। পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, শীতের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএম হলের বারান্দায় থাকা এবং রাতে ছাত্রলীগের কর্মসূচিতে যাওয়ার কারণে হাফিজুর ঠান্ডায় আক্রান্ত হন।

এর পরিণতিতে অনেক সময়েই তাঁর উপরে নেমে আসে অবর্ণনীয় অত্যাচার। গেস্টরুমে বিচার বসবে, কান ধরে উঠবোস, মার ধোর ইত্যাদি চলবে। সামান্য ক্যালকুলেটর ফেরত চাওয়াতে দুর্যোগ বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের ছাত্র ক্লাসের প্রথম স্থান অধিকারী এহসান রফিককে পিটিয়ে আধমরা করে ছাত্রলীগের ছাত্র নামধারী গুন্ডারা। পৈশাচিক পিটুনীতে তাঁর বাম চোখের কর্ণিয়া পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

এই অমানবিক প্রক্রিয়ার মধ্যে থেকে একটা ছাত্র আস্তে আস্তে মানবিকতা হারিয়ে ফেলতে থাকে। শুধু তাই নয়, এক সময় যে অন্যায় ক্ষমতার একটা বিকৃত আনন্দও পেতে থাকে। সে মনে করে সে অসহায় তাঁর পাশে কেউ নেই। তাই প্রতিবাদ করে তো লাভ নাই। তাই এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়ে যতটুকু লাভ নেয়া যায় তাই ভালো।

তখন আস্তে আস্তে তাঁর মধ্যে একটা মানসিক পরিবর্তন আসতে থাকে। একসময় সে এই ক্যাডার বাহিনীর অন্যতম সদস্য হয়ে উঠে। ক্যান্টিনে যেয়ে খেয়ে না পয়সা দিয়ে চলে আসে। ম্যানেজার টাকা চাইলে চড় থাপ্পড় মারে। অন্যান্য ছাত্ররা একটা ভয় মিশ্রিত সমীহ নিয়ে চলে।

সে অনুভব করে যে সে আর গ্রাম থেকে উঠে আসা ভীত সন্ত্রস্ত ছেলেটি আর নেই। সে পরিণত হয়েছে একজন উল্টো ভীতিকর ক্ষমতাশালী মানুষকে। এটি থাকে এক ধরনের বিকৃত আনন্দ আর পরিতৃপ্তি দেয়। সে নিজেই তখন হয়ে উঠে একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। কিছুদিন পরে হয়তো তাকেই দেখা যায় গ্রামের একদল নিরীহ ছেলেকে তাঁর মতন কর্কশ, গুন্ডাতে পরিণত করার প্রক্রিয়াতে যুক্ত।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে এই পুরো প্রক্রিয়াটি ঘটে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থেকে শুরু করে হলের প্রভোস্ট, হাউজ টিউটর , সেই ছাত্রটি যেই বিভাগে পড়ে সেই বিভাগের শিক্ষক শিক্ষিকাদের সম্পূর্ণ গোচরে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ কিভাবে আমরা, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা এই অমানবিক প্রক্রিয়াটির একটা নীরব দর্শক হয়ে কাটিয়ে দিচ্ছি।

এই নিষ্ঠুর আর চরম অন্যায় প্রক্রিয়ার মধ্যে আরেকটি অদ্ভুত বিষয় হচ্ছে যারা এই পুরো প্রক্রিয়ার ভিকটিম তাঁদের অদ্ভুত নীরবতা। ধরা যাক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৩৭০০০ হাজারের মতন ছাত্র ছাত্রী আছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য এইসব আবাসিক হলে আছে। এদের একটা ক্ষুদ্র অংশও যদি প্রতিবাদ করে তাহলেও কিন্তু একটা বিশাল প্রতিক্রিয়া হয়।

এইটা বলে কি আমি আমাদের শিক্ষকদের দায় এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি? না, আসলে শিক্ষকদের ব্যাপারে চরম হতাশা থেকে আমি বলছি। বাংলাদেশের বিভিন্ন পেশায় সামগ্রিক মানের যে চরম অবনমন ঘটেছে সেটা থেকে শিক্ষকতাও বাদ যায় নাই। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সামগ্রিক মানের অবনমনে কিছু শিক্ষকদের দায় অস্বীকার করার উপায় নাই।

কাগজে কলমে বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রশাসনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়োজিত পদাধারী ব্যক্তিবর্গ সাধারণত রাজনৈতিক ভাবে মনোনীত হয়ে থাকেন। সেই মনোনয়নের প্রধান উপাদান হচ্ছে রাজনৈতিক প্রভুদের প্রতি শর্তহীন আনুগত্য। এর ফলে কাগজে কলমে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বায়ত্বশাসিত হলেও এটি পরিচালিত হয় পুরোপুরি রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে। একাডেমিক কোন উদ্দেশ্য বা পরিবেশ এর মধ্যে নেই।

আর সাধারণ শিক্ষক বা ছাত্র ছাত্রীদের কল্যান এর মধ্যে কোন রকম ভাবেই নেই।

সাধারণ ছাত্র ছাত্রীদের তাই এখন সিদ্ধান্ত নিতে হবে তাঁরা কি সেই আগের ক্যাম্পাসেই ফিরে যাবে নাকি একটি মানবিক ক্যাম্পাস গড়ে তোলার প্রত্যয় নিয়ে সব কিছু আবার শুরু করবে।

সাধারন ছাত্র ছাত্রীদের অধিকার তাঁদের নিজেদেরকেই আদায় করতে হবে। এইটা তাঁদের এতোদিনে বুঝে যাওয়ার কথা। সেই অধিকার আদায়ের পন্থা খুঁজে পাওয়াটাই হবে অতিমারী পরবর্তী ক্যাম্পাসে ফিরে যেয়ে প্রথম কাজ।